কলকাতার নগর বিন্যাসের মূল রূপ

সুনীল মুন্সী

''কলকাতা ভারতের মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা মনোরম শহর''
চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া, ১৯৩৫

[ক]

নগরের গঠনবিন্যাস বা কাঠামো ও তার কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে অনেক আলোচনা অতীতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। সকল শহরের গঠন বিন্যাস এক নয়, বিভিন্ন ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের দরুণ তাদের গড়ে ওঠার ইতিহাসও বিভিন্ন। এমনকি বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবেশ সমপ্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজের গঠন ও ইতিহাসকে একেবারে এক বলে কেউ নেনে করবেন না। মিল এক জায়গায় অবশ্য পাওয়া যাবে, এ মিল আছে নগরের জন্ম ও বৃদ্ধির মৌলিক সূত্রে।

গ্রাম ও শহরের পার্থক্য প্রসঙ্গে মার্কস একাধিকবার বলেছেন, প্রথম আধুনিক শহরের আবির্ভাব ঘটেছিল যখন সামাজিক শ্রমবিভাগের ফলে কৃষি থেকে শিল্প ও বাণিজ্য পৃথক হয়ে সৃষ্টি হলো গিল্ডের শহর। তারপর বাণিজ্য থেকে শিল্প পৃথক হয়েছে, বাণিজ্যের ব্যাপ্তির ফলে বিচ্ছিন্ন শহরগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং উৎপাদনের ক্রমবিকাশের ফলে শ্রমবিভাগ আর এক ধাপ এগিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক এক ধরনের শিল্প উৎপাদনে পারদর্শী এক একটি শহর। অর্থাৎ গঠন ও আকৃতি যাই হোক না কেন, কোন শহরকেই উৎপাদন ব্যবস্থাজাত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা সম্ভব নয়। তবু এই অসম্ভবকেই সম্ভব বলে চালানোর চেষ্টা সামাজবিজ্ঞানে অনেক কাল ধরে চলে এসেছে। শহরের গঠন বা কাঠামো নিয়ে বহু জটিল তর্ক পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে শহরের সম্পর্ককে সর্বদাই কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। একই কারণে তৃতীয় দুনিয়ার নগর সমস্যা নিয়ে আলোচনায় প্রাক্ - স্বাধীনতাযুগে চাহিদা ও স্বাধীনতা-উত্তর কালে নয়া উপনিবেশবাদের চাপ আলোচনায় স্থানই পায় না।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে শহরের কাঠামোর মৌলিক সম্পর্ক নিয়ে এঙ্গেলস্ অন্তত পুরো দুখানা বই-এ আলোচনা করেছেন, একটি 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' ও অন্যটি 'বাসস্থানের প্রশ্ন'। প্রথম বইটিতে এঙ্গেলস্ বলেছেন, সম্পত্তির চূড়ান্ত কেন্দ্রিকতা ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের শহরগুলিতে। সবগুলি শহর এক ধরনের নির্মম সামাজিক লড়াই-এর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। উৎপাদন ও জীবনধারণের প্রকরণগুলির উপর সরাসরি অথবা বকলম দখলদারী কায়েম করে মূলধনকে অস্ত্র করে এই লড়াই চলে। তাই গরীব নগরবাসী শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত যা জোটে তাতে মানুষের মতো জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ম্যাঞ্চেস্টার, এডিনবরা, গ্লাসগো প্রভৃতি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বড় বড় শহরগুলির কাঠামোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, এইসব শহরগুলি তৈরি হয়েছে উপরোক্ত সামাজিক লড়াই-এ বিত্তবানদের স্বার্থের অনুকূলে, যাতে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ ও অর্থবান সম্পদশালী মানুষের জীবনধারার মধ্যে থাকে আকাশ-জমিন ফারাক। সম্পদশালীদের এমনই এক অনুক্ত অথচ অনমনীয় মনোভাব রূপ পেয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টারে। ব্যবসা, বাণিজ্য, অফিস - কাছারি ও গুদামঘর নিয়ে গড়ে উঠেছিল শহরটির কেন্দ্রস্থল। সেখান থেকে প্রশস্ত শড়ক চলে গিয়েছিল নানাদিকে, তাদের দুপাশে লাইন দেওয়া দোকান পাট। কেন্দ্রকে প্রায় বৃত্তাকারে ঘিরে চাপা ঘিঞ্জি একটি শীর্ণ বলয়ের মধ্যে ছিল শ্রমজীবী মানুষের বাসস্থান। তারও বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর একটি বলয় গড়ে উঠেছিল সম্পত্তিবান মানুষের ঘরবাড়ি বাগান নিয়ে। শহরের কেন্দ্রর সঙ্গে এই বহিরাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করেছে বড় বড় সড়কগুলি। প্রতি বছরই ম্যাঞ্চেস্টারের আকৃতি একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়েছে, পুরানো ঘরবাড়ি ভেঙে নতুন ঘরবাড়ি উঠেছে, জমির দাম বেড়েছে হু হু করে, কিন্তু শহরের এই মৌলিক কাঠামোতে কোনো ব্যতিক্রম আসে নি। হয়তো প্যারিসের মতো শ্রমজীবী মানুষকে নগর উন্নয়নের নামে এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সামাজিক লড়াই শেষ হয় নি, বরঞ্চ তীব্রতর হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানী লুই মামফোর্ড বলেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই শহরকে সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় একটি সংগঠন হিসাবে ভাবা শেষ হয়ে গেছে, শহরকে দেখা হয়েছে বাণিজ্যের উদ্যোগক্ষেত্র হিসাবে। শহরের কাঠামো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে জমির দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ব্যবসা - বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং শহর থেকে মুনাফা লোটা যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে জমি নিয়ে ফাটকাবাজীর মুনাফা হয়ে দাঁড়াল নগর পরিকল্পনার মূল চালিকাশক্তি।

পরবর্তীকালে ইউরোপীয় শহরগুলি যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র থেকে শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হতে থাকল তখন চালিকাশক্তিতেও এল পরিবর্তন। খনি, শিল্প ও রেলপথ হয়ে দাঁড়াল শহরগুলির কাঠামোর মূল ভিত্তি। ধ্বনি উঠল—শিল্পের প্রয়োজনে নগর। এই ধ্বনির সঙ্গে শিল্পের উৎপাদন সম্পর্ক যেন নগরে প্রতিফলিত হলো। এইসব শিল্পনগরগুলির নতুন পরিবেশকে মামফোর্ড অভিহিত করেছেন 'কারখানা, রেলপথ ও বস্তি' বলে। অর্থাৎ শিল্পোদ্যমের প্রয়োজনে শহর, পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সাথে রেল লাইন মারফৎ সেই শহরের গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক, এবং কারখানার প্রয়োজনে কোনক্রমে জীবনধারণের জন্য উপযোগী গড়ে ওঠা বস্তি, যেখানে হাজার মানুষ জীবিকা উপার্জনের আশায় জড়ো হবে, কিছু সৌভাগ্যবান কলে - কারখানায় তাদের শ্রম বিক্রি করতে সমর্থ হবে আর বাকিরা থেকে যাবে বেকারবাহিনী হিসাবে। পশ্চিমের যে কোনো শিল্পনগরীর এই ছিল মূল কাঠামো। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের লন্ডন, লিভারপুল ও হাল - এর মতো বন্দর ও ব্যবসাকেন্দ্রে অথবা ক্লাইভ উপত্যকা, উত্তর - পূর্ব ল্যাঙ্কাশায়ার, পশ্চিম রাইডিং এবং পশ্চিম মিডল্যাণ্ডের মতো খনি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রথম দিকে কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। সাধারণত হালকা শিল্প, বিশেষ করে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কাঁচা মালের ভিত্তিতে যে-সব কারখানা তৈরি হয়েছিল তাদের অধিকাংশই স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিল বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে।

ফরাসী অর্থনীতিবিদ পিয়ের যোসেফ প্রুধোঁর সাথে বিতর্ক করতে গিয়ে এঙ্গেলস্ 'বাসস্থানের প্রশ্ন' বইটিতে লিখেছিলেন, শহরের ভূসম্পত্তির যারা মালিক, তারা জমি কেনে, বেচে বা বাড়ি ভাড়া দেয় একান্তই ব্যবসায়িক স্বার্থে। জমি বা বাড়ি এখানে বেচা - কেনার বস্তু। এতে শুধু যে শ্রমিক লুণ্ঠিত হয় তাই নয়, মধ্যবিত্ত মার খায় মুনাফাখোরদের হাতে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এই ফল। যতদিন এমন অবস্থা অব্যাহত থাকবে ততোদিন অতি কুখ্যাত শূকরের খোঁয়াড়ের জন্যও ভাড়াটে মিলবে এবং গৃহের মালিক হিসাবে ধনিক ও বণিকের অধিকার ও কর্তব্যই হবে তার সম্পত্তি থেকে ভাড়া বাবদ যত বেশি আয় করে নেওয়া যায় তার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা

চালিয়ে যাওয়া।

কাজেই নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা যখন আজকাল আমরা শুনি তখন শহরের কাঠামোর কথা মনে উদয় হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক, যে কাঠামোতে আজও সেই সামাজিক লড়াই-এর প্রতিফলন ঘটছে।। একথাও মনে রাখতে হবে, মার্কস বা এঙ্গেল্‌স যে সব শহরের কথা লিখেছিলেন সেগুলির সবই অবস্থিত ছিল স্বাধীন শিল্পোন্নত দেশগুলিতে। সাম্রাজ্য থেকে সংগৃহীত বিপুল ঐশ্বর্য তাদের শিল্পোদ্যমকে শক্তি যুগিয়েছিল, তাদের নাগরিক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। সাম্রাজ্য থেকে সম্পদ আহরণের আকাঙ্খায় একই সময়ে উপনিবেশগুলিতে যে আর এক ধরনের নগরের পত্তন হচ্ছিল, তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল নিতান্তই ভিন্ন। এখানে নগর গঠনের মূল চালিকাশক্তি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলেও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিশেষ পদ্ধতি নগর পরিবেশে এক বিপুল পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল। ফলে তৃতীয় দুনিয়ার নগর কাঠামোতেও এমন অনেক বিশেষত্ব থেকে গেছে যা ইংলণ্ড, ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় চোখে পড়ে না। চলতি কথায় আমরা বলি বটে যে আমাদের দেশের কোনো এক শহর ইউরোপের কোনো এক শহরের যে প্রতিবিম্ব। কিন্তু এ শুধু কথা। আসলে আমাদের দেশের পক্ষেই ঠিক ইউরোপীয় কোনো শহরের প্রতিবিম্ব হওয়া সম্ভব নয়, কলকাতার পক্ষে তো নয়ই। কলকাতার কাঠামো নিয়ে খানিকটা আলোচনা এই সূত্রেই প্রাসঙ্গিক হবে।

[খ]

ইংরাজ সাম্রাজ্যের ব্যবসা - বাণিজ্য ও শাসনের তাগিদে গঙ্গার ধারে কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বসতি ও বাজার নিয়ে কলকাতার জন্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত কলকাতার একমাত্র কাজই ছিল ব্যবসা, ভারতে ইংরাজ ব্যবসায়ের বৃহত্তম ঘাঁটি হিসাবে। ১৮২০ সাল থেকে ১৯০০ শতকের মধ্যে, কিছু আগে বা পরে, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার প্রায় সমস্ত রাজধানী যখন শিল্পনগরীতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং 'শিল্পের প্রয়োজনেই মহানগর' এই আওয়াজ সর্বত্র পুরানো হয়ে যাচ্ছে, কলকাতায় তখনো চলছে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজত্ব।

১৮৫৪ সালে প্রথম চটকল বসলো রিষড়াতে, কলকাতা শহরের বাইরে। তারপর ১৮৬০, ১৮৭২-৭৩, ১৮৮২-৮৫ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাঁচ বছরে ধাপে ধাপে চটকলের বিপুল প্রসার ঘটলেও তার অধিকাংশই স্থাপিত হলো কলকাতার বাইরে। কলকাতার নগরসীমানার মধ্যে গড়ে উঠল মাত্র তিনটি চটকল ও দুটি জুট প্রেস। অন্যদিকে ১৯০৩ -৪ সালে হুগলি নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চলে মোট চটকলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৬টি। তাতে প্রতিদিন শ্রমিক নিযুক্ত হতো গড়ে প্রায় ১ লক্ষ ২৩ হাজারের মতো। শহরের চারপাশে তখন তেলকল ছিল ৬৩টি, ২৪টি ময়দাকল, ২টি চালকল, ১৬টি ছোটখাট লোহার কারখানা, ১২টি চামড়ার কারখানা ইত্যাদি। এই সবে কাজ করতে প্রায় ১৩ হাজার শ্রমিক।

১৯০১ সালে আদমশুমারির হিসাবে দেখা গেল কলকাতার প্রায় ৪ লক্ষ ৪২ হাজার নগরবাসীর মধ্যে শতকরা ৫ জন সরকারি চাকুরে, ১৮ জন গৃহস্থালির কাজে নিযুক্ত, ৭ জন অদক্ষ শ্রমিক, ব্যবসায় নিযুক্ত ২৪ জন, ৩২ জন উৎপাদন ও উৎপাদিত বস্তু সরবরাহের কাজে নিযুক্ত। কলুটোলা, মুচিপাড়া, ভবানীপুর, এন্টালি ও বেনিয়াপুকুরকে চিহ্নিত করা হলো ছোটখাটো হস্ত শিল্পকর্মের অঞ্চল হিসাবে, আর ব্যবসার জন্য জোড়াসাঁকো, বড়বাজার ও জোড়াবাগান অঞ্চলকে। বড়তলা ও ভবানীপুরে উকিল, মোক্তার ও ডাক্তার ইত্যাদি পেশাদার ব্যক্তির আধিক্য দেখা গেল।

চল্লিশ বছর পরে ১৯৪১ সালে, ফ্যাক্টরি আইনের আওতায় পড়ে এমন কারখানার সংখ্যা কলকাতায় চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় ছিল ১৯৪টি ও সেই সব কারখানায় দৈনিক কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকের গড় সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭,৪৫৮। কলকাতার পৌর এলাকার জনসংখ্যা তখন ২১ লক্ষাধিক। অর্থাৎ হিসাবপত্রে কারখানার সংখ্যা প্রায় দুশো হলেও অধিকাংশই ক্ষুদ্র। তার আবার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই ছিল উপনিবেশবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সরকারি ও সওদাগরি অফিস - কাছারি ও তার ছত্রছায়ায় পুষ্ট হাজার দপ্তরখানার ছাপার চাহিদা মেটাতেই কেন্দ্রীয় কলকাতার কলকারখানার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছিল নিযুক্ত এবং তারই ভিত্তিতে কলকাতার শিল্প নগরী আখ্যা, একথা ভাবতেও যেন অস্বস্তি লাগে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, সার্কুলার রোড বেষ্টিত কেন্দ্রীয় কলকাতার বাইরে পৌর এলাকার প্রান্তে ইতিমধ্যেই কিছু কারখানা গড়ে উঠেছে। যদি ধরাও যায় যে এই অঞ্চলগুলিও শহরতলির শিল্পাঞ্চলকে কলকাতার মধ্যে গণ্য করে হিসাব কষা উচিত তাহলেও দেখা যাবে হাওড়া, হুগলি ও ২৪ পরগণা জেলায় যে মাত্র ৮.৬ শতাংশ মানুষ ১৯৪১ সালে ফ্যাক্টরি আইনের আওতাভুক্ত কারখানাগুলিতে কাজ করতেন তাদের সঙ্গে খাস কলকাতার সম্পর্ক ছিল অতি নগণ্য। কলকাতার পৌর এলাকায় সুযোগ - সুবিধাগুলি থেকে সযত্নে তাদের বাইরে রাখা হয়েছিল। শহরতলির কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

স্বাধীনতার ১৩ বছর পরে ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে দেখা গেল কলকাতার গৃহশিল্প বাদে অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত আছেন শহরের জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ মানুষ। ১৯৭১ সালে তা থেকেও এক শতাংশ কমে গেল। এই হিসাবে ফ্যাক্টরি আইনের আওতায় পড়ে এমন কাবখানার বাইরেও অনেক ছোটখাট কারখানা ধরা আছে যার সংখ্যা চিরকালই কলকাতায় অসংখ্য। সার্কুলার রোড বেষ্টিত কেন্দ্রীয় কলকাতায় শুধুমাত্র ফ্যাক্টরি আইনের আওতায় পড়ে এমন কারখানা ও তাতে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ধরে দেখা যাবে ১৯৬০ সালে ৫৩১টি কারখানায় কাজ করতেন প্রায় ২৩ হাজার মানুষ। আর এই ১৯ হাজারের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৭ জন ছিলেন নানাবিধ ছাপাখানা, প্রকাশনী ও তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কাজে নিযুক্ত। অর্থাৎ ১৯৪১ সালের পর ৩০ বছরের কর্মক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কলকাতার চেহারা বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় নি।

[গ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে কলকাতার বিচ্ছিন্ন বসতিগুলিতে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বসতিগুলির আকারও। ফলে কিছুকালের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতা আপাতদৃষ্টিতে ক্রমশ মুছে গেলেও এক ধরনের বিভেদ জন্মচিহ্ন হিসাবে রয়ে গেল। একদিকে গঙ্গা অন্যদিকে লবণহ্রদ এরই মাঝে লম্বভাবে যে কলকাতা গড়ে উঠল তার কেন্দ্রে থাকল লালদিঘি, পুরানো কেল্লা ও রাইটার্স বিল্ডিংকে ভিত্তি করে ইউরোপীয় ব্যবসা, বহুবাজার স্ট্রীটের উত্তরে গড়ে উঠল ভারতীয় অঞ্চল, দক্ষিণে ধর্মতলা স্ট্রীট পর্যন্ত একটি মিশ্র অঞ্চল ও তারও দক্ষিণে সার্কুলার রোড অবধি ইউরোপীয় বসতি। মিশ্র অঞ্চলকে হয়তো পুরানো পর্তুগীজ, গ্রীক বা আর্মেনিয় এলাকা বলে চিহ্নিত করা সম্ভব। সি. আর. উইলসনের লেখা থেকে জানা যায়, ইউরোপীয় অঞ্চলের মতো উত্তরে ভারতীয় অঞ্চলে বড় ও লাল বাড়িগুলি ছিল নদীর ধারে। তাদের পিছনে ছিল মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের ভিড়। সার্কুলার রোডের দক্ষিণে পদ্মপুকুর ভবানীপুর অঞ্চলে আরও একটি ভারতীয় বসতি ছিল, আকারে অনেক ছোট। কিছু অবস্থাপন্ন ভারতীয় থাকতেন এখানে।

১৮৩৩ সালে কলকাতার তদানীন্তক চীফ ম্যাজিস্ট্রেট শাসন ও উন্নয়নের সুবিধার জন্য নগর কলকাতাকে চারটি মূল অঞ্চলে ভাগ করার সুপারিশ করেছিলেন। আপাতঃদৃষ্টিতে এক হলেও যে বিচ্ছিন্নতা কলকাতায় রয়ে গিয়েছিল এই সুপারিশে তার প্রমাণ মিললো। চীফ ম্যাজিস্ট্রেট ম'ফারলান - এর প্রস্তাবিত চারটি বিভাগ ছিল এই রকমের ঃ (১) **উচ্চ উত্তর ডিভিশন** — উত্তরে মারাঠা খাল; দক্ষিণে মেয়ুয়াবাজার রোড, কটন স্ট্রীট থেকে মীরবাহার ঘাট; পূর্বে সার্কুলার রোড; পশ্চিমে হুগলি নদী। (২) **নিম্ন উত্তর ডিভিশন—** উত্তরে মেছুয়াবাজার রোড, কটন স্ট্রীট, মীরবাহার ঘাট; দক্ষিণে বৈঠকখানা রোড, বহুবাজার স্ট্রীট এবং হেয়ার স্ট্রীট থেকে পুলিশ ঘাট; পূর্বে সার্কুলার রোড এবং পশ্চিমে হুগলি নদী। **(৩) উচ্চ দক্ষিণ ডিভিশন —** উত্তরে বৈঠকখানা রোড এবং বহুবাজার স্ট্রীট থেকে পুলিশ ঘাট; দক্ষিণে ধর্মতলা স্ট্রীট ও এস্‌প্ল্যানেড রো থেকে চাঁদপাল ঘাট; পূর্বে সার্কুলার রোড ও পশ্চিমে হুগলি নদী। (৪) **নিম্ন দক্ষিণ ডিভিশন—** উত্তরে ধর্মতলা স্ট্রীট ও এস্‌প্ল্যানেড রো থেকে চাঁদপাল ঘাট; দক্ষিণে ও পূর্বে সার্কুলার রোড; পশ্চিমে ফোর্ট উইলিয়ামের মাঠ।

এই চারটি ডিভিশনের প্রথম দুটিতে ছিল মূল ভারতীয় বসতি। তৃতীয় ডিভিশনটি মিশ্র অঞ্চল, চতুর্থ ডিভিশনটি সম্পূর্ণভাবেই ইউরোপীয়। ম'ফারলান - এর প্রস্তাব অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে সরকার গ্রহণ করলেও কাজ আরম্ভ হলো শুধুমাত্র তৃতীয় মিশ্র ডিভিশনে, অর্থাৎ ভারতীয় ও ইউরোপীয় অঞ্চলের যোগাযোগ স্থলে। ভারতীয় অঞ্চলের দুর্দশার বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন এখানে নেই। নোংরা, অস্বাস্থ্যকর সর্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ এই অঞ্চল থেকেই হামেশাই নানা সংক্রামক ব্যাধি অনায়াসে ইউরোপীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। কাজেই তৃতীয় অঞ্চলের উন্নতির মানে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বসতির মধ্যে একটি 'মধ্যবর্তী' বাধা'র (buffer) অঞ্চল সৃষ্টি করা। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, প্রথম ডিভিশনে সে সময় ঘরবাড়ি ছিল অপেক্ষাকৃত কম, কিছু অবস্থাপন্ন ভারতীয়ের বড় বড় বাগানবাড়ি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় ডিভিশনে গঙ্গার দিকে নদীর সাথে সমান্তরালভাবে তৈরি হয়েছিল ভারতীয় ব্যবসাদারদের মূল কর্মকেন্দ্র সুতানুটির বাজার।

এর প্রায় ৬৬ বছর পরে ১৮৯৯ সালে ম্যাকেঞ্জি আইন গৃহীত হলো। এতে বলা হলো, তিনটি স্বার্থরক্ষা কলকাতা পৌরসভার কর্তব্য ঃ প্রথম, শহরটিকে যারা ভারতে ব্যবসা - বাণিজ্যের পীঠস্থান হিসাবে গড়ে তুলেছে সেইসব ইউরোপীয় ব্যবসায়িক স্বার্থ; দুই, ভারত উপনিবেশের রাজধানী হিসাবে কলকাতাকে যারা বিশ্বের দরবারে বিপুল প্রতিপত্তি দিয়েছে সেই সরকারি স্বার্থ; তিন, শহরের বাড়ি ও জমির দেশি-বিদেশি মালিকের স্বার্থ।

ইতিমধ্যে আশেপাশের কিছু গ্রাম নিয়ে কলকাতার আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৮৮৮ সালের আইনে উপকণ্ঠের ৭টি গ্রামকে যোগ করে শহরটিকে ভাগ করা হয়েছে ২৪টি ওয়ার্ডে। ১৮৯৯ -এর আইনে শহরটিকে যে নতুন চারটি ডিভিশনে ভাগ করা হলো তার চেহারা এই রকম ঃ

১. উত্তর ডিভিশন – ১ থেকে ৬নং ওয়ার্ড; জনসংখ্যা ২১৫,৫৫৫
২. মধ্য ডিভিশন – ৭ থেকে ১১ নং ওয়ার্ড ; জনসংখ্যা ১৬৪,৩২৮
৩. দক্ষিণ ডিভিশন – ১২ থেকে ১৯নং ওয়ার্ড; জনসংখ্যা ১২৪০৫৯
৪. শহরতলি ডিভিশন– ২০ থেকে ২৫নং ওয়ার্ড; জনসংখ্যা ১৪৫,৮১৯

সমসাময়িককালে কলকাতার কাঠামো বর্ণনা প্রসঙ্গে ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়র লিখল, বিশাল ময়দানবেষ্টিত ফোর্ট উইলিয়াম শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এর উত্তরে আছে ইউরোপীয়দের দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির অফিস আর পূর্বে অবস্থিত তাদের বসতি। দক্ষিণ ও দক্ষিণ - পূবে বালিগঞ্জ ও আলিপুর মূলত ইউরোপীয় উপকণ্ঠ। আলিপুরের লেফটেনেন্ট গভর্নরের বাড়ি। ইউরোপীয় বসতিকে চতুর্দিক থেকে যেন ঘিরে রয়েছে ভারতীয় বসতি। লালদিঘির ইউরোপীয় ব্যবসাকেন্দ্রের ঠিক উত্তরে আছে দেশী ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র বড়বাজার। তিনটি প্রধান সড়ক ভারতীয় বসতি অঞ্চল ভেদ করে দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেছে, আর গোটা ছয়েক রাস্তা পূর্ব থেকে পশ্চিম গঙ্গার ধার পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা করেছে।

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়রের এই বর্ণনার সাথে ম্যাকেঞ্জি আইনের সামঞ্জস্য আছে। ওয়ার্ড হিসাবে দেখলে বলা যায় ইউরোপীয় বসতি তখন প্রতিহত হয়েছিল দক্ষিণ ডিভিশনের ১৬ (পার্ক স্ট্রীট), ১৭ (বামুন বস্তি) ও ১৮ (হেস্টিংস) নং ওয়ার্ডে। শহরতলি ডিভিশনের ২১ (বালিগঞ্জ ও টালিগঞ্জ) এবং ২৩ (আলিপুর) নং ওয়ার্ডেও ছিল ইউরোপীয়দের প্রাধান্য। এর চারপাশে মধ্য ডিভিশনের ১০ নং ওয়ার্ড (বহুবাজার), দক্ষিণ ডিভিশনের ১২ (ওয়াটারলু স্ট্রীট), ১৩ (ফেনউইক বাজার), ১৪ (তালতলা), ১৫ (কলিঙ্গ বা চৌরাঙ্গী), ১৯ (এন্টালি) এবং শহরতলি ডিভিশনের ২৪ (কেবালপুর) ও ২৫ (ওয়াটগঞ্জ) নং ওয়ার্ডের মিশ্র অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিমাণে ইউরোপীয় পরিবার বসবাস করত। উত্তর ও মধ্য ডিভিশনের বাকি ওয়ার্ডগুলিতে গড়ে উঠেছিল মুখ্যত ভারতীয়দের বসতি।

বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুল হারে এবং মিশ্র অঞ্চলে জনসংখ্যা প্রায় স্থির রয়ে গেছে। ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে দশ বছরে ইউরোপীয় অঞ্চলে জনসংখ্যা কমেছে প্রায় বিশ শতাংশ, ভারতীয় অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ এবং মিশ্র অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ। কিন্তু তবু অতীতের বিচ্ছিন্নতা কাটে নি— অন্তত স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত। ১৯৬১ সালে কলকাতার নগর কাঠামোর যে চিত্র আমরা পাই তাতে দেখা যায়, ইতিমধ্যে কলকাতার চেহারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে বয়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং যানবাহন শিল্প ও বন্দরের কাজ ভিত্তি করে শহরের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ - পশ্চিম প্রান্তের কিছু কিছু স্থানে ঘন শ্রমিক বসতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু এগুলি ও ডালহৌসি স্কোয়ারের কেন্দ্রীয় বণিক অঞ্চল বাদ দিলে বাকি কলকাতার সবটাই বসতি ও খুচরা বাজারের মিশ্রণ। স্বাধীনতার পরেও শহরের কাঠামোর কোন মূল পরিবর্তন হয়নি, শুধুমাত্র ইউরোপীয় ও ভারতীয়— শহরের এই দুটি বিভাগ অপসৃত হয়ে নতুন আর এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা আবির্ভূত হয়েছে।

[ঘ]

ইংরেজরা কলকাতায় নগর পত্তন করল, কলকাতাভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের লাভের অংক আকাশচুম্বী হলো, কিন্তু কলকাতার বন্দর, লালদিঘির ইউরোপীয় অফিস চত্বর, চৌরাঙ্গী-পার্কস্ট্রীটের বসতি অঞ্চল, উত্তর - দক্ষিণে বা পূর্ব - পশ্চিমে যোগাযোগ রক্ষা করে এমন কয়েকটি প্রধান রাস্তা, রেলগাড়ি চালু হলে শিয়ালদহ হাওড়ার রেল যাতায়াত ব্যবস্থা—এইগুলি ছাড়া অন্য কোনো নাগরিক সমস্যা তাদের কোনদিন বিশেষ ভাবিত করেছে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ অজস্র প্রমাণ মিলবে কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়ন চিন্তায় তাদের কত ঘোরতর অনীহা ছিল।

বলা হয় ১৮১৭ সালে স্থাপিত লটারি কমিটি শহরে প্রথম ব্যাপক উন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য দায়ী। লটারি কমিটির উদ্যোগে যে কাজগুলি সম্পন্ন হলো তা থেকে এত উন্নয়নের চরিত্র পরিষ্কার বোঝা যাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কলকাতাকে একটি পুরোদস্তুর

ব্যবসাকেন্দ্রে রূপ দেবার প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছিল শহরের মধ্যে এবং শহরের সাথে বহির্জগতের যোগাযোগ ব্যবস্থা পাকাপাকি ও সুদৃঢ় করা। কলকাতায় লটারি কমিটির প্রথম কাজই হলো তাই। হেস্টিংস থেকে নিমতলা ঘাট পর্যন্ত ষ্ট্রান্ড রোড তৈরি হলো। এরই সমান্তরালে পার্ক স্ট্রীট থেকে ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট হয়ে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উত্তর প্রান্তে রাস্তার মোড় পর্যন্ত নির্মিত হলো দ্বিতীয় রাজপথ। এদের সাথে সমকোণ সৃষ্টি করে ম্যাংগো লেন, কাশীতলা, কলুটোলা, মির্জাপুর স্ট্রীট, হেয়ার স্ট্রীট প্রভৃতি তৈরি হলো। এই ভাবেই একদিকে উত্তর শহরতলি এবং সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতের সাথে কলকাতা বন্দরের যোগসূত্র স্থাপনের একটি প্রাথমিক কর্তব্য সাধিত হলো, অন্যদিকে ষ্ট্রান্ড রোড থেকে সার্কুলার রোডের মধ্যে সমগ্র কলকাতা এসে গেল গঙ্গার উপর প্রতিষ্ঠিত বন্দরের চৌহদ্দির মধ্যে। কলকাতাকে বেঁধে ফেলা হলো কতগুলো চৌকো খোপের মধ্যে।

সড়ক নির্মাণ বাদে লটারি কমিটির বাকি সব কাজই সীমিত থাকল ইউরোপীয় বা মিশ্র অঞ্চলে। তালিকা করা উপস্থিত করলে তার বিবরণ নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়ায় ঃ মিঃ ক্যামাকের জমি কিনে তার যথাযথ উন্নতি, সাহেব মেমসাহেব চৌরাঙ্গীতে তাদের পুত্রকন্যাদের নিয়ে যাতে বেড়াতে পারে তার ব্যবস্থা, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কিড স্ট্রীট ইত্যাদি নির্মাণ, ইউরোপীয় অঞ্চলে সব রাস্তা পাকা করা, রাস্তায় জল দিয়ে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা চালু করা, শর্ট বাজারের প্রভূত উন্নতিসাধন করা ইত্যাদি।

কিন্তু কলকাতার এতটুকু উন্নতিও শহরের ইংরেজ ব্যবসাদারী স্বার্থের সামান্যতম ত্যাগ স্বীকারের ফলে সম্ভব হয়েছে একথা ভাবা নিতান্তই ভুল। ১৯০১ সালে আদমশুমারির রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, লটারি মারফৎ অর্থ সংগ্রহ না করলে উন্নয়নের জন্য সম্ভবত কোন কাজই করা যেত না। কারণ ইংরেজ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নগর উন্নয়নের জন্য বর্ধিত হারে কর দিতে বারবার প্রবল আপত্তি জানিয়েছে। চীফ ম্যাজিস্ট্রেট ম'ফারলান -এর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৩৩ সালে গঠিত কলকাতার চারটি আঞ্চলিক কমিটিতে উন্নয়নমূলক কাজে উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে দেখা গেলে ইউরোপীয়রা একেবারেই নিরাসক্ত। নগর উন্নয়নে এই অনীহা পরবর্তীকালে কলকাতা পৌরসভার কাছে অনীহা হিসাবে প্রকাশ পেল। ১৮৮৫ সালে দেখা গেল পৌরসভার ভোটদাতা হিসাবে নাম রেজিষ্ট্রি করার জন্য ইউরোপীয়রা মোটেই উৎসাহী নয়, ফলে ইউরোপীয় বা মিশ্র ওয়ার্ডগুলিতে ভারতীয় অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম ভোট পড়ল। এর পর থেকে পৌরসভার প্রতিটি নির্বাচনে একই চিত্র প্রকাশিত হয়েছে—কলকাতা পৌরসভার কাজে দেখা গেছে ইউরোপীয়দের চরম উদাসীনতা। ক্রমেই ঘটনা এমন দাঁড়িয়ে গেল যে, পৌরসভায় ইউরোপীয়দের বক্তব্য উপস্থিত করার মূল দায়িত্ব বর্তালো বেঙ্গল অব কমার্স, পোর্ট কমিশনার্স, জুট মিলস্ এসোসিয়েশন, হেলথ সোসাইটি ইত্যাদি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের উপর। সি.ই. ক্যারিংটন তাঁর বই 'দি ব্রিটিশ ওভারসীজ' -এ লিখেছেন, ইংরাজদের পক্ষে ভারতবাস ছিল হয় ছুটিতে বিদেশ ভ্রমণ, চাকুরির প্রয়োজনে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জনের আশায় বাধ্যতামূলকভাবে বিদেশবাস কিংবা বনবাসের মতো একটি ঘটনা— সবটাই সাময়িক। ভারত উপনিবেশের এই শহর উন্নয়নে না ছিল তাদের অবসর, না ছিল মানসিক প্রবৃত্তি। যতটুকু না হলে চলে না তার বেশি সময়, অর্থ ও পরিশ্রম দিতে তারা ছিল নিতান্তই পরাঙ্মুখ। নিজেদের অর্থোপার্জনে কোনো গুরুতব বিঘ্ন উপস্থিত না হলেই তারা সন্তুষ্ট। তাই পৌরসভায় তাদের প্রতিপত্তি সব সময়ে সুরক্ষিত থাকলেও তাতে কাজ হতো না। এমনকি অনেক সময় প্রতিনিধি নির্বাচনেও অনাগ্রহ প্রকাশ পেত। যেমন ১৯৮৮ সালে আইনে ইউরোপীয় ওয়ার্ডগুলিকে ১৬ জন ইউরোপীয় কমিশনার নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করার জন্য প্রার্থী পাওয়া গেল মাত্র ৯ জনকে।

লটারি কমিটির প্রায় একশত বছর পরে ১৯১১ সালে কলকাতায় প্লেগ রোগের মড়ক দেখা দিলে একটি কমিশন বসেছিল। কমিশনের প্রস্তাব ছিল, কলকাতায় মহামারী প্রতিরোধ করতে হলে কিছু কিছু জনবহুল বস্তি এলাকা ভেঙে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে, নতুন রাস্তা তৈরি করতে হবে, হাওয়া চলাচলের জন্য খোলা জায়গার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে, এরই ফলশ্রুতি কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে তার আয় -এর মুখ্য অংশ সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। গত ৬৮ বছরে রাস্তাঘাটের উন্নতির ক্ষেত্রে কলকাতা বেশ কয়েকটি অঞ্চলে সি-আই-টি তার কর্মোদ্যমের পূর্ণ সাক্ষ্য রেখেছে ঠিকই, কিন্তু নগর পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন সূচনা করে নি। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে উত্তর ও উত্তর - পূর্ব কলকাতার অনেক বস্তি অঞ্চল ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট পরিষ্কার করেছে। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে টালিগঞ্জে নতুন বস্তি তৈরি হচ্ছে। সি-আই-টি সরকারিভাবে নীলাম চালু করে জমিতে সীমাহীন ফাটকাবাজী সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষকে নগরসীমা থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা দ্রুততর করেছে, স্বাধীনতার পরে মধ্যবিত্তের জন্য কিছু গৃহ নির্মিত হলেও তার সংখ্যা এতই নগণ্য যে উদ্বাস্তু - মানুষের অতি সামান্য ভগ্নাংশই এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছেন। তাই লটারি কমিটির উদ্যোগের সাথে সি-আই-টি-র উদ্যোগের কোন গুণগত পার্থক্য আছে এমন কথা বলা চলে না।

অতি সম্প্রতিকালে সি.এম.ডি. কলকাতা উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে যে পরিকল্পনা চালু করেছে তারও প্রধান কথা রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ ও নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা আমরা পরে করব।

১৯৪১ সালে আদমশুমারির সময় মহানগর কলকাতাকে ৩০টি ওয়ার্ডে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। বেলগাছিয়া, মানিকতলা, বেলেঘাটা কলকাতার মধ্যে চলে এসেছে। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জনসংখ্যার যে ঘনত্ব আদমশুমারিতে প্রকাশ পেল, তাতে কলকাতার পুরানো কাঠামোই প্রতিবিম্বিত হলো। একর প্রতি ঘনত্ব সবচেয়ে কম দেখা গেল বামুনবস্তি, আলিপুর, পার্ক স্ট্রীট, ওয়াটারলু স্ট্রীট, বালিগঞ্জ ও টালিগঞ্জে। সর্বাধিক ঘনত্ব দাঁড়াল বহুবাজার থেকে শ্যামপুকুর অঞ্চলের মধ্যে এবং দক্ষিণের প্রাক্তন ভারতীয় অঞ্চল পদ্মপুকুরে। ইতিমধ্যে কলকাতায় একমাত্র পরিবর্তন এসেছে সি আই টি -র কল্যাণে। কিছু বস্তি উচ্ছেদ করে কিছু মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর গৃহসংস্থান হয়েছে, বড়বাজার থেকে শুরু করে উত্তর কলকাতার ব্যবসায়ী অঞ্চলে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ -এর মতো প্রশস্ত রাস্তা নির্মিত হয়েছে, দক্ষিণের লেক অঞ্চলকে উচ্চবিত্তদের বসবাসের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই সবের ফলে তখনকার কলকাতায় এক ধরণের চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হলো। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীরা বড়বাজার থেকে দক্ষিণে দৃষ্টি ফেরালেন। সি আই টি-র কাজের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সামাজিক কাঠামোয় পটপরিবর্তন সূচিত হলো বটে কিন্তু তাতে মহানগরের মৌলিক চরিত্রে কোন নতুনত্ব এলো না।

[ঙ]

শহরতলির শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে খাস কলকাতার সম্পর্কে কোনো হেরফের কোনকালেই হয়নি। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যাপক অর্থে শহরতলি গড়ে ওঠার ধারা উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একেবারে গোড়ার দিকে ত্রয়োদশ শতাব্দী বা তারপরে শহরের মড়ক মহামারী লেগে গেলে মানুষ পালিয়ে শহরতলিতে বাসা বাঁধতো। মামফোর্ড বলেছেন, ইংলণ্ডে শহরতলিগুলি শুরুতে যেন ছিল শহরের গ্রামীণ isolation words। প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে লন্ডনে ষ্ট্রাণ্ডের দুধারে ছিল ধনী ব্যক্তিদের প্রাসাদ, তাদের বাগানবাড়ি ছিল টেমস্ - এর ধারে ধারে বহুদূর পর্যন্ত ছড়ান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন শহরগুলি কারখানা ও বস্তিতে ঘিঞ্জি

হয়ে উঠল তখন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা স্বভাবতই শহরতলির দিকে ছুটলেন। পরবর্তীকালে রেলপথ এবং রাজপথ শহর থেকে শহরতলির দিকে বড় মানুষের স্রোতকে শক্তিশালী করেছে, শহর এবং শহরতলি দুই ক্রমে ক্রমে বহির্মুখে প্রসারিত হয়েছে। সুইজি অনেক পরে লিখেছেন, আমেরিকায় যে মোটরগাড়ি একদিন শহর ও শহরতলি গড়েছে, আজ সেই হয়েছে কাল, শহর ও শহরতলির নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়েছে, মানুষের পক্ষে নগরবাসই যে অসম্ভব করে তুলেছে।

গত একশ বছরে শিল্পোৎপাদনে যত পরিবর্তন এসেছে, কারখানায় আয়তন যত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন যত জটিলতর হয়ে উঠেছে ততই শহরের কেন্দ্র থেকে কারখানা সরে গেছে প্রাক্তন শহরতলির দিকে। লন্ডনে প্রথম শিল্প গড়ে ওঠে মূল ব্যবসাকেন্দ্রের চারপাশে মূলত ইষ্ট এণ্ড-এ। শহরের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পও ছড়িয়ে যায়, প্রথমে শহরতলিতে, পরে তারও বাইরে। খাস প্যারিসের ইস্ট এণ্ড -এ (১১,১২,১৯ ও ২০ আরঁদাস্‌মাঁ) ছোট ছোট শিল্প বহুকাল ধরেই কেন্দ্রীভূত— বিশেষ করে হালকা যন্ত্রশিল্প, জামাকাপড় তৈরির কারখানা বা আসবাবপত্রের কারখানা। বিংশ শতাব্দীর বৃহৎ শিল্পগুলি খানিকটা সরে গিয়ে গড়ে উঠেছে শহরতলিতে। নিউ ইয়র্ক -এর ম্যানহ্যাটন - কে ভিত্তি করে যে মহানগর গড়ে উঠেছে তার কেন্দ্রে বণিক অঞ্চলের ঠিক উত্তরে চেম্বার্স ও হাউস্টন স্ট্রিটের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে লণ্ডন ও প্যারিসের মতই এখানে বড় নতুন শিল্প - কেন্দ্রগুলি সরে গেছে শহরতলিতে বা আরও দূরে। টোকিও কেন্দ্রস্থলের উত্তর - পূর্বে সুদিমা নদীসৃষ্ট সমভূমিতে, দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল দিয়ে কাওয়াসাকির দিকে এবং কাওয়াসাকি থেকে ইয়োকোহামার মধ্যে বিশাল শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। টোকিও মহানগরের ভারি শিল্পকেন্দ্র ইয়োকোহামা। মহানগরের উত্তর - পূর্ব সমপ্রকৃতির। বোম্বাই শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে ভারতীয় মালিকানাধীনে কারখানা শিল্প প্রথম স্থাপিত হয় ও ধীরে ধীরে শহরতলিতে বিস্তার লাভ করে। স্বাধীনতার পর এখানে অন্যতম প্রথম কাজই হয় বৃহৎ বোম্বাই শিল্পাঞ্চলকে মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত করে নাগরিক শহরগুলির প্রায় বিপরীত। বিদেশি শাসনকালে এই প্রয়োজন ইংরাজরা একবারও বোধ করেনি, আর শিল্পে ভারতীয় স্বার্থ ছিল এতই নগণ্য যে একথা ভাববার অবকাশও ভারতীয় শিল্পপতিদের ছিল না। হুগলি শহরতলিতে প্রথম কারখানা ওয়েলিংটন জুট মিল বসে হুগলি জেলার রিষড়াতে, ১৮৫৫ সালে। এর পরে ধীরে ধীরে আরও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এই জেলায়,— শ্রীরামপুরে ইণ্ডিয়া জুট মিল (১৮৬৬ সাল), চাঁদপাই জুট মিল (১৮৭৩ সাল), ভিক্‌টোরিয়া জুট মিল ও হেস্টিংস জুট মিল (১৯৮৮ সাল) ইত্যাদি। সুতাকল প্রধানত কেন্দ্রীভূত হয় শ্রীরামপুর মহকুমায়। হাওড়ায় আধুনিক শিল্পকারখানা আসে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে যখন এখানে জাহাজ সারাই - এর কাজ চালু হয়। তারপর বসে বস্ত্রবয়ন শিল্প— শিবপুর-ও চব্বিশ পরগনার যে ২৮টি শহরে ১৯৫১ সালে শিল্পের প্রাধান্য ছিল, তার মধ্যে ১৯টি ছিল মূলত চটশিল্পকেন্দ্র। শিল্পের ভিত্তিতে কলকাতা থেকে প্রশাসনিকভাবে বিচ্ছিন্ন অথচ কলকাতার সংলগ্ন যে জনবসতিগুলির জন্ম হলো, সেগুলিতে পৌর শাসনের সূচনা হলো শহরগুলি কলকাতার গুরুত্ব পেল না। কলকাতার নাগরিক সুযোগ - সুবিধাগুলি থেকে তার বঞ্চিত থাকল। কলকাতার সঙ্গে শহরতলির শিল্পাঞ্চলের সম্পর্ক ছিল শুধুমাত্র লালদিঘি বা ডালহৌসি স্কোয়ারের সওদাগরী ও বণিক সভাগুলি মারফৎ, আর ছিল কলকাতা বন্দরের সঙ্গে। সব কারখানাগুলির সদর দপ্তর স্থাপিত হলো লালদিঘির চারপাশে। শহরগুলিতে কারখানার বাইরে মিল মালিকদের কোনো সংগঠনও রইল না। কাজেই কলকাতার নগরসীমা প্রায় আগাগোড়াই অপরিবর্তিত রয়ে গেল, সামান্যতম নাগরিক সুবিধাগুলি সীমিত থাকল কলকাতায় পৌর এলাকার মধ্যে। শিল্পাঞ্চলের শহরগুলি রয়ে গেল যেন লালদিঘির জমিদারীর ছিটমহল হিসাবে। কিন্তু সেখানেও কারখানা ও ইউরোপীয় মালিকদের বাসস্থান বাদ দিয়ে নগর সম্পর্কে ইউরোপীয় মিল মালিকদের চরম উদাসীনতার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

পৌর কলকাতার বাইরে চটকলেরই রাজত্ব। জুট মিল এসোসিয়েশনের ইংরাজ কর্তাব্যক্তিরা বার বার ঘোষণা করেছে, শহরতলিতে উন্নয়নের কোনো দায় -দায়িত্ব তাদের নেই, সুতরাং পৌরসভাগুলিকে উন্নয়নের জন্য অর্থসাহায্য করার কথাও ওঠে না। পৌরসভাতে বস্তির মালিক বা জমিদারের চেয়ে মিল মালিকদের বেশি খাজনা দিতে হয় বলে ইংরাজ মিল মালিকদের রাগের অন্ত ছিল না। এখানে কারখানায় কর্মরত বা তার বাইরের শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতিকে, নয়তো শহরের পৌর সংস্থা অথবা বস্তির মালিক ও জমিদারের। অধ্যাপক রণজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর একটি লেখায় এই বিষয়ে ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরি আইনের ফলাফল কেমন দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে একটি রিপোর্টের উত্তরে চিঠিটি তদানীন্তন বঙ্গ সরকারের কাছে লেখা। লেখার ছত্রে ছত্রে কারখানার বাইরে নগর ও নগরবাসী সম্পর্কে চূড়ান্ত অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই একদিকে কলকাতা উন্নয়ন চিন্তা ও পরিকল্পনা সব সময়েই থেকে গেছে কলকাতা পৌর অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্যদিকে শহরতলিতে কারখানাগুলির সঙ্গে বাকি শহরের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই কোনদিন গড়ে ওঠে নি।

কলকাতা শিল্পাঞ্চলের গোড়াপত্তন হয় গঙ্গার অপর পারে হাওড়া ও হুগলিতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কলকাতা - হাওড়ার মধ্যে হুগলি নদীর উপর একটি রেল সেতু নির্মাণের সময় ভেঙে পড়ায় প্রথম চেষ্টা পণ্ড হয়। পরে ১৯৭৫ সালে সারবাঁধা নৌকার উপর একটি পনটুন সেতু চালু করা হয়। পনটুন সেতুর স্থলে রবীন্দ্রসেতু নির্মিত হয় ১৯৪৫ সালে। বালীতে বিবেকানন্দ সেতু দিয়ে যাতায়াত শুরু হয় ১৯২৭ -২৮ সালে। অর্থাৎ এই শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বছর পর্যন্ত মাত্র একটি পনটুন সেতু দুই পারের মধ্যে কোনক্রমে যোগাযোগ রক্ষা করেছে। অন্যদিকে বৃহৎ কলকাতার মধ্যে নদীর দু-ধারে অবস্থিত মহানগর পৃথিবীতে যতগুলি আছে সবখানেই একাধিক সেতু নদীর উভয় তীরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে। লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো, বুদাপেস্ত প্রভৃতি শহরগুলির উল্লেখ এই সূত্রে করা যেতে পারে। তবে কোন ক্ষেত্রেই নদীগুলি হুগলি নদীর মতো প্রশস্ত নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। কলকাতার কাছে হুগলি নদীতে সেতু নির্মাণ অনেক কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। তবু একথা মনে হতেই পারে যে ভারতে বহু ক্ষেত্রে অসংখ্য ব্যয়বহুল কাজ একই সময় যখন করা দিয়েছে তখন কলকাতার সঙ্গে শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ যথাযথ গুরুত্ব পেলে এখানেও একাধিক সেতু নির্মাণ অসম্ভব ছিল না। ব্রিটেনে ফোর্থ নদীর উপরে এক মাইল দীর্ঘ ক্যান্‌টিলিভার সেতু ১৮৯০ সালেই নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল।

[চ]

১৯৬১ সালে কলকাতার উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মার্কিন ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় সি এম পি ও তৈরি করে এই মহানগরের ভূমি ব্যবহারে 'আমূল পরিবর্তন' আনার পরিকল্পনা রচনায় নবপ্রয়াস শুরু হয়। সি এম পি ও ঘোষণা করল, অতীতের দুশো বছরে কলকাতার সমস্যা নিয়ে অনেক বোর্ড, কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে, অনেক রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে সামান্য যেটুকু উন্নতি হয়েছে তার চরিত্র থেকে গেছে অসংলগ্ন ওপ্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। সুতরাং সি এম পি ও-র লক্ষ্য হলো কলকাতার জন্য এমন একটি পরিকল্পনা রচনা করা মহানগরের ভূমি ব্যবহারে যা গুণগত পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে।

পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনা নানা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে আলোচনার পূর্বে কলকাতার যে কাঠামোতে সি এম পি -ও আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছে সে সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন। যে বছর সি এম পি ও গঠিত হয় সে বছর কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ২৯ লক্ষ। এর মধ্যে ১০ লক্ষ বাস করত বস্তিতে ও আরও দশ লক্ষ বাসস্থান ছিল নামে বস্তি না হলেও কাজে বস্তিরই

মতো ঘরবাড়িতে। এর মধ্যে কর্পোরেশনের আইন অনুযায়ী ১০ কাঠার কম জমিতে গড়ে ওঠার ফলে বস্তি হিসাবে স্বীকৃত নয় এমন অনেক বসতি ধরা আছে। ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার লোক বাস করত একেবারেই ফুটপাতে। মহানগরের একেবারে কেন্দ্রস্থলের পাঁচটি ওয়ার্ড বাদ দিলে আর সব ওয়ার্ডগুলির .৫০ শতাংশ থেকে ৩০.৫ শতাংশ স্থান দখল করে বস্তিগুলি ছড়িয়ে ছিল। কলকাতা পৌর অঞ্চলের উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ - পশ্চিমের কলকারাখানাগুলিকে কেন্দ্র করে জমাট বেঁধে উঠেছিল সবচেয়ে বড় বড় বস্তিগুলি। অন্যদিকে কলকাতা ময়দানকে ঘিরে বড়বাজার থেকে প্রায় সার্কুলার রোড পর্যন্ত একটি দীর্ঘ এলাকায় ছিল কলকাতার কেন্দ্রীয় ব্যবসা অঞ্চল প্রসারিত। বাকি কলকাতার সবটাই ছিল নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্তদের বাসস্থান অথবা খুচরো বাজার।

বৃহৎ কলকাতার ভূমি ব্যবহারে যে পরিবর্তন সি এম পি -ও প্রস্তাব করল তার মূল কথা উন্নততর অর্থনৈতিক কাজের জন্য কলকাতার জমির পুনর্বিন্যাস। পুনর্বিন্যাসের সরল অর্থ অবশ্য ছিল কলকাতা থেকে বস্তি উচ্ছেদ করতে হবে। সি এম পি ও - র কলকাতার বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনায় বলা হলো, বেসরকারি প্রচেষ্টায় কিছু কিছু বস্তি পরিষ্কার করে সেখানে অফিস বা বসবাসের জন্য বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে বটে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা চলছে অত্যন্ত শ্লথগতিতে ও বিচ্ছিন্নভাবে। কলকাতার বস্তিগুলিকে উচ্ছেদ করা বিশেষভাবে দরকার, কারণ এখানে জমির দাম খুব চড়া এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদাকে খানিকটা মদত দিতে হলে জমি ব্যবহারে একমাত্র এইভাবেই পরিবর্তন আনা সম্ভব। তাই দ্রুত ও সুসংবদ্ধ কাজের তাগিদে সরকারি হস্তক্ষেপ আশু প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদা বলতে আসলে কি ভাবা হয়েছিল ৯টি বাছাই করা এলাকার অবস্থান বর্ণনায় তা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, বলা হলো, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট -এর কাজের ফলে পূর্বের বস্তি অধ্যুষিত উল্টাডাঙ্গা - বেলেঘাটা - মানিকতলা এলাকা মধ্য ও উচ্চবিত্তদের বাসস্থানের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। উত্তর ও দক্ষিণ পঞ্চান্নগ্রাম বাদে টালিগঞ্জ ইতিমধ্যেই বসতি এলাকা হিসাবে বেশ খানিকটা আভিজাত্য অর্জন করেছে, বসতির ভাল অঞ্চল হিসাবে সাউথ সুবার্বন এলাকাটি ক্রমশই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, ইত্যাদি। অর্থাৎ বেসরকারি প্রচেষ্টায় অথবা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট -এর উদ্যোগে বিচ্ছিন্নভাবে এবং ধীরেধীরে বস্তিউচ্ছেদ করে সেইসব জমিতে বহুতলাবিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মাণ করে যে ভাবে কলকাতার জমির উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবহার শ্লথগতিতে চালু হচ্ছিল, তাকে দ্রুততালে এগিয়ে নেবার জন্য, কলকাতাকে বস্তিশূন্য করে নোংরামির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সি এম পি ও-র পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার সঙ্গে দেড়শ' বছরের আগেকার লটারি কমিটির পরিকল্পনার খুব বেশি প্রভেদ নেই। পার্থক্য এক জায়গায় অবশ্য আছে। লটারি কমিটি ইউরোপীয় ও ভারতীয় এই দুই কলকাতার অস্তিত্বকে চিরস্থায়ী ধরে নিয়ে ইউরোপীয় বণিকদের বসবাস ও অর্থোপার্জনের পরিবেশকে খানিকটা উন্নত করার প্রয়াস করেছিল। ইউরোপীয়রা সশরীরে এখন আর কলকাতায় বিশেষ নেই। কিন্তু দুই কলকাতা এক হয় নি। দুই - তৃতীয়াংশ বস্তি ও ফুটপাতবাসী কলকাতার নোংরা, অভাব - অভিযোগ এবং বিক্ষোভ থেকে এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ কলকাতাকে রক্ষা করে, তার বসবাস ও অর্থোপার্জনের পরিবেশ কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতে সচেষ্ট হয়েছে সি এম পি ও । এমন কি এই কাজে দুই - তৃতীয়াংশ নগরবাসীকে শহরতলিতে হাটিয়ে দিয়ে খাস মহানগরের সবটাই বিত্তবানদের জন্য সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যেও নানাভাবে ঘোষিত হয়েছে।

অন্যদিকে বৃহৎ কলকাতার শ্রমিক অঞ্চলের সঙ্গে পৌর কলকাতার সম্পর্কে গত একশ বছরে যে সামান্য কয়েকটি পরিবর্তন এসেছে তার একটি হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নানা কাজে শহরতলি ও কলকাতার মূল ব্যবসাকেন্দ্রের মধ্যে দৈনিক যাত্রীসংখ্যার অভাবনীয় বৃদ্ধি। স্বাধীনতার পর শহরতলির কারখানাগুলি হস্তান্তরিত হয়ে মূলত অবাঙালি মালিকানাধীন হয়েছে। ফলে শিল্পাঞ্চলের পক্ষে পৌর কলকাতার সঙ্গে যুক্ত হবার স্বপক্ষে কোন নতুন তাগিদ সৃষ্টি হয় নি এবং শিল্পাঞ্চল ও পৌর কলকাতা এই দুইয়ের মধ্যে বিভেদের 'ইউরোপীয়' প্রাচীরও অপসারিত হয়নি, যদিও অতি সম্প্রতিকালে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সি এম পি ও বলেছে, সমগ্র শিল্পাঞ্চল নিয়ে কলকাতার উন্নয়নের কথা এখনও বলবার সময় আসে নি। তাই উন্নয়নের প্রায় সব কাজেই পৌর কলকাতায় সীমিত, কয়েকটি মূল রাজপথ নির্মাণ এবং পানীয় জল সরবরাহের কিছু ব্যবস্থা বাদে। ভবিষ্যতে জমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে পূর্ব, দক্ষিণ - পশ্চিম ও দক্ষিণ কলকাতায় নতুন শিল্প এলাকা গঠনের যে প্রস্তাব সি এম পি ও করেছিল, তা কাগজে কলমেই রয়ে গিয়েছে, কারণ ইদানিং কালে নতুন শিল্প কলকাতায় প্রায় একেবারেই স্থাপিত হয়নি। আধুনিক অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শহরগুলিতে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও তার ভিত্তিতে অঞ্চল বিভাজন প্রবর্তিত হয়েছিল। এই নিয়ন্ত্রণের মূল কথা ছিল শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার তাগিদে শহরের ভূমিকায় প্রয়োজনীয় শৃংখলা ও কর্মকুশলতা নিয়ে আসা। স্বভাবতই এতে শ্রমজীবী মানুষের বাসস্থান, তাদের যাতায়াত ও অন্যান্য সামাজিক সুযোগ সুবিধাগুলি কিছুটা প্রাধান্য পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত ব্যবসার স্বার্থে শহরের জমির মূল্যমান এক উচ্চগ্রামে বেঁধে রাখাও ছিল এই সব পরিকল্পনার মুখ্য চেষ্টা। আমাদের কলকাতায় নগর পরিকল্পনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কাজে পরিণত হচ্ছে, যদিও প্রথমটি অনুপস্থিত। কাজেই সব মিলিয়ে কলকাতার জমি ব্যবহারের বিশেষ নতুন কোনো ব্যবস্থাপনার ইঙ্গিত নেই। মামফোর্ড যাকে বলেছিলেন শিল্পের জন্যই নগর তার আভাষও কলকাতার ক্ষেত্রে পাওয়া দুষ্কর। কলকাতা যেন থেকে গেছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বহিরঙ্গের কিছু আধুনিক অলংকরণ বাদে।

কলকাতাকে ভারতের মহানগর আখ্যা দিয়ে যাঁরা ভেবেছিলেন হয়তো বা তার ফলে এই মহানগরের উন্নয়নের জন্য সারা দেশে উদ্যোগের খানিকটা মানসিকতা সৃষ্টি হবে, হয়তো বা বিদেশি বণিকদের সৃষ্ট নগর কাঠামোয় অন্তত আধুনিক ধনতন্ত্রের হাওয়া লাগবে, তাঁদের সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। উচ্চবিত্তদের হাসপাতাল, গুটিকয়েক নার্সিং হোম, স্কুল - কলেজ, শিল্প প্রদর্শনীর স্থান, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নাটকের মঞ্চ, কৃত্রিম বরফে খেলা ঘর, মন্দির, ইন্‌ডোর স্টেডিয়াম ইত্যাদি কোন শহরে ধনতান্ত্রিক আবহাওয়া এনে দেয় না। কিছু প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করলে গাড়ি চেপে শহরের মধ্যে বা শহরের বাইরে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু দু-পাশে পায়ে - চলা পথ সংকুচিত হতে হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে গাড়ি ছাড়া যাতায়াত প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। চওড়া রাজপথ এলেই কলকাতার পক্ষে নিউইয়র্ক হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পায়ে - চলা পথ তুলে দিয়ে কলকাতাকে নিজের মতো করে আধুনিক হবার সুযোগ দেওয়া হবে না। অদূর ভবিষ্যতে প্রশস্ত রাজপথ, মেট্রো রেল এবং বহুতলবিশিষ্ট বাড়ি...ধনতান্ত্রিক আধুনিকতার এই বহিরাভরণ কলকাতার অঙ্গ শোভা বৃদ্ধি করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ যেন লোমচর্মা বৃদ্ধার গায়ে বেনারসী শাড়ির শোভা।